বাংলার ইতিহাস: খলজি, তুর্কি ও বলবনী শাসন (১২০৪-১৩৩৮ খ্রি.)

ইউনিট ৪

ভূমিকা:

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। এ উপমহাদেশের মুসলিম বিজয়ের সূচনা হয় অষ্টম শতাব্দির প্রারম্ভে। যদিও পরবর্তীতে দ্বাদশ শতকের শেষদিকে ঘুরি এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে তথাকথিত মামলুক শাসকদের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়েছিল। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ছিলেন বাংলার মুসলিম শাসনের সূচনাকারী। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় খলজি, তুর্কি এবং বলবনী শাসনের সূচনা ঘটে এবং এ রাজবংশগুলো বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১ ঃ মুসলিম আগমনের পূর্বে বাংলার অবস্থা
পাঠ- ২ ঃ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়: চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ- ৩ ঃ বাংলায় খলজি শাসন (১২০৬-১২২৭ খ্রি.)
পাঠ- ৪ ঃ বাংলায় তুর্কি শাসন (১২২৭-১২৮১ খ্রি.)
পাঠ- ৫ ঃ বাংলায় বলবনী শাসন (১২৮১-১৩২০ খ্রি.)

পাঠ-৪.১ মুসলিমদের আগমনের পূর্বে বাংলার অবস্থা

উদ্দেশ্য

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুসলিম আগমনের পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে পারবেন;
- মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- এ যুগে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**জনপদ, মাৎস্যন্যায়, কৌলিন্য প্রথা ও সনাতন ধর্ম**

ভূমিকা

'রাষ্ট্র' হিসেবে বাংলার রয়েছে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে। প্রাচীনকাল থেকে এর নানা অঞ্চলে প্রয়োজনানুসারে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো জনপদ। মৌর্য ও গুপ্ত যুগ পেরিয়ে বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্ক কর্তৃক বাংলা শাসনের সূত্রপাত ঘটলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এরই ধারায় বাংলায় মাৎসন্যায়ের যুগ শুরু হলে অষ্টম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে চার শতাব্দি ব্যাপী স্থায়ী পাল শাসনের সূত্রপাত হয়। একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে পাল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে সেন শাসনের সূচনা হয়। এয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভে সেনরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে মুসলিম বিজয়ী বীর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন বাংলায় সেন রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এর নানা স্থানে স্থানীয় সামন্ত শাসকের উদ্ভব ঘটেছিল। সে যুগে মিথ্যা কৌলিন্য ও আভিজাত্যের যাতাকলে নিস্পেষিত হয়েছিল বাংলার সামাজিক জীবন। বাংলার বর্ণবাদী সমাজের অর্থনীতি ছিল গ্রামভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর। বিত্তশালী ও নিম্নবিত্তের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রচুর। এ সময় বাংলায় বৌদ্ধদের সহনশীল ধর্ম চিন্তার সাথে হিন্দু ধর্মের বাড়াবাড়ি ও প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। তবে সে যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা

সমকালীন উৎসের অভাবে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট করে জানা যায় না। প্রাপ্ত বিভিন্ন লিখিত ও অলিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে 'বাংলা' নামে কোন একক রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। এদেশ তখন অনেকগুলি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকরা যার যার মত করে শাসন করত। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠা এলাকাগুলিকে বলা হত জনপদ। প্রাচীন বাংলার এসব জনপদের মধ্যে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রাপ্ত নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপি থেকে জানা যায় যে, এরই ধারায় মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রি.পূ.) বর্তমান বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত পুন্ড্র জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মৌর্য সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠলে রাঢ় ও বঙ্গ জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মৌর্য শাসনের অবসান ঘটলে বাংলায় শুঙ্গ শাসনের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় যে, শুঙ্গ শাসনকালেও পুন্ড্র নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। এরপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কুষাণগণ কিছুদিন এবং পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল বলে জানা যায়। গুপ্ত রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়েই উত্তরবঙ্গেও কিছু অংশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ মেলে।

বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক ও মাৎস্যন্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনোত্তর যুগে পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের দুর্বলতা ও বিরোধী মৌখরিদের উৎপাতের সুযোগ নিয়ে গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন সামন্ত শশাঙ্ক গৌড় অঞ্চলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙালি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্ক (আনু.

৬০৬-৬৩৭খ্রি.) বাংলার খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে বাংলাকে একটি একক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ গ্রামে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও বাংলায় মহা দুর্দিন নেমে আসে। হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মনের হাতে একদিকে যেমন বিশাল গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় অন্যদিকে ক্ষমতাশালী ভূ-স্বামীরা একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে উঠে। কোন কেন্দ্রিয় শাসন না থাকায় সামন্ত শাসকরা যে যার মত চারদিক জবর দখল করে ফেলেছিল। পাল তাম্রশাসনে এই অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলার এরূপ নৈরাজ্যময় যুগ প্রায় একশ বছর স্থায়ী ছিল।

পাল যুগ

শশাঙ্ক পরবর্তী প্রায় একশ বছরের বিক্ষিপ্ত শাসনামলের অরাজকতায় বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এই অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অষ্টম শতাব্দির মধ্যভাগে দেশের জনগণ মিলিত হয়ে গোপাল (৭৫৬-৭৮১খ্রি.) নামক এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করেন। তাঁর চেষ্টায় বাংলায় নবযুগের সৃষ্টি হয়। গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৮১-৮২১খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। দশম শতাব্দিতে পাল বংশের গৌরব স্তিমিত হতে থাকে। পশ্চিম বাংলার বরেন্দ্রে কৈবর্ত নেতা ভীম ও দিব্যোক কিছু সময়ের জন্য ক্ষমতা দখল করেন। কৈবর্ত শাসন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। পাল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক রামপাল পালরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্ত তিনি পাল বংশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সফল হননি। ফলে তার মৃত্যুর পর পাল শাসন আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। পালদের এই দুর্বলতার সুযোগ সেনরা বাংলায় সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সেন যুগ

অযোগ্য পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলার ব্যাপক অংশ নিয়ে একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় সেন শাসনের সূচনা হয়। সেনদের আদি বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট জেলায়। দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন তারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালক্রমে তারা ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে সামন্ত সেনের নাম পাওয়া যায়। তবে বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০খ্রি.) ছিলেন এ বংশের প্রথম রাজা। অতঃপর সেনবংশের রাজা হন বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮খ্রি.)। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৪খ্রি.) পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার গৌড় ছিল তার প্রধান রাজধানী। এর অপর নাম ছিল লক্ষণাবতী। পরবর্তীতে তিনি তার রাজধানী নদীয়ায় স্থাপন করেন। তিনি গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান জয় করেন বলে জানা যায়। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে সেন রাজ্যে অতীব দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে চারপাশের সামন্ত শাসকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সুন্দরবন অঞ্চলের ডোম্মানপাল ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পট্টিকেরা নামে এক রাজ্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেব নামে এক রাজা সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সেনদের এ দুর্বল পরিস্থিতিতে এয়োদশ শতকের শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানগণ উত্তর ভারত হয়ে আক্রমণের সূচনা শুরু করলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতে দিল্লি বিজয়ী বীর মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহার বিজয় সমাপ্ত করে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে অতর্কিতে লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। এ অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব মনে করে রাজা লক্ষণ সেন পলায়ন করে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা খলজিদের অধিকারে চলে যায়। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষণসেনের মৃত্যু হয়। এর স্বল্প দিন পরেই সেন রাজত্বের অবসান ঘটে। এভাবে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলার নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

সামাজিক অবস্থা

প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার জনগণের জীবনমান অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত ছিল। জনগণ নানা পেশায় নিয়োজিত ছিল। কৃষিকাজ ছিল তাদের প্রধান পেশা। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর, শ্রমিক, যোদ্ধা, তাঁতি, সুতার, স্বর্ণকার সহ নানা সামাজিক পেশার লোক ছিল। এসময় যোদ্ধা, ধর্মযাজক, পন্ডিত, চিকিৎসক ও অভিজাতগণ উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন। এর ফলে সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির জীবনমানে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয় ছিল। অভিজাতগণ সমাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সর্বদা সকল সামাজিক সুবিধা ভোগ করতেন। এ কারণে এ যুগে বাংলায় আর্য প্রভাবেই বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার

সূত্রপাত ঘটে। আর্য সমাজ প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এ চারটি শ্রেণি ছাড়াও অনেক শঙ্কর জাতির জনগণও বংলায় বসবাস করত। সেনযুগে ব্যাপক বর্ণবিন্যাস লক্ষণীয়। এ সময় জাতিভেদ প্রথা এতটাই প্রকট ছিল যে সমাজে ৩৬ টি জাতিগোষ্টীর মানুষ বসবাস করত। কিন্তু একটির সাথে অন্যটির কোন সামাজিক যোগাযোগ ছিল না। ফলে তাদের সমাজে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি অনুপস্থিত ছিল। সে যুগে বাংলার জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। বাঙালি চরিত্র ছিল কোমল। বাঙালি জাতির সারল্য, সাধুতা, বিদ্যানুরাগ, মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তবে তাদের চরিত্রে দৃঢ়তা, সাহসিকতা, চঞ্চলতা ও ব্যস্তবাগীশতাও বিরাজমান ছিল। সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা ছিল না। পিতা-মাতা ও স্বামীর পরিবারের অধীনেই তাদেরকে থাকতে হত। সমাজে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথাও প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন বাংলায় নর-নারীর প্রধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধুতি ও শাড়ি। পুরুষেরা মালকোচা দিয়ে ধুতি পরিধান করত এবং তা হাঁটুর নিচে নামত না। মেয়েদের শাড়ি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত। ধুতি বা শাড়ি ছাড়াও পুরুষেরা চাদর ও মেয়েরা ওড়না পরত। উৎসব বা বিশেষ উপলক্ষে নারী-পুরুষ উভয়েই বিশেষ ধরণের পোষাক পরত। নারী-পুরুষ উভয়েই আঙ্গুলে আংটি, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে বালা, কটিতে মেখলা, পায়ে মল ইত্যাদি গহনা পরত। আহার্য দ্রব্য হিসেবে ডাল, ভাত, মাছ, গোশত, শাকসবজী, ফলমূল, দুধ, দই, ঘি, ক্ষীর ইত্যাদি প্রধান খাদ্য ছিল। ইলিশ মাছের খুব বেশি কদর ছিল। শুটকি মাছও প্রিয় খাদ্য রূপে গণ্য হত। ভোজ উৎসবে নানা প্রকার মসলাযুক্ত মাংসের ব্যঞ্জন, পিঠা ইত্যাদি এবং কর্পুর মেশানো সুগন্ধি পানি পরিবেশন করা হত। এ সময় নানা রকম মাদক পানীয়েরও ব্যবহার হত। ভোজের পর পান শুপারিও পরিবেশন করা হত। প্রাচীন বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আদৌও উন্নত ছিল না। স্থলপথে গরুর গাড়ি ও জলপথে নৌকা প্রধান বাহন ছিল। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, পালকি প্রভৃতি ব্যবহার করত। বর্ষাকালে সাধারণ মানুষ ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করত। মালামাল পরিবহনের জন্য বড় বড় বজরা নৌকা ব্যবহৃত হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ছিল কৃষি নির্ভর। বর্তমানকালের মত তখনও বেশির ভাগ লোক গ্রামেই বাস করত। গ্রামগুলি ছিল কৃষিভিত্তিক এবং শহরগুলি ছিল শিল্প কারখানা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। বাংলার উর্বর মাটিতে প্রচুর ধান, পাট, ইক্ষু, তুলা, সরিষা, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি উৎপন্ন হত। আখের চাষ প্রচুর পরিমাণে হত। আখের রস থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় তৈরি হত এবং তা বিদেশেও রপ্তানি করা হত। সে যুগে কলা, আম, কাঁঠাল, লেবু, ডালিম ইত্যাদি নানা প্রকার ফলমূল ও সবজির চাষ হত। গরু, ছাগল, হাতি, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি পশু পালিত হত। ভূমির মালিক শাসকগণ হলেও কৃষকেরা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। তবে মজুর, দরিদ্র দূর্দশাগ্রস্থ ও ভূমিহীন কৃষক লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন বাংলা কৃষি প্রধান হলেও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। সে যুগে বাংলার বস্ত্র শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দিতে প্রচুর উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র বাংলা থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। এ সময় ধাতু শিল্প এবং মৃৎ শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল। কর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি কারিগরদের দ্বারা এ শিল্প উন্নত হয়েছিল। বাংলার কাঠ শিল্প তখন বেশ উন্নত ছিল। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। নৌ ও স্থল পথে বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন হাট, বাজার ও বন্দরে নিয়ে যাওয়া হত। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন পণ্য বাইরেও রপ্তানি করা হত। শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য দিনার এবং রূপক নামের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে সে যুগে কড়ি ব্যবহৃত হত।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করাই তার স্বজাত প্রবৃত্তি। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়েই বাংলায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সভ্যতার বিকাশের ধারায় আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নতুনভাবে গড়ে উঠে। সভ্যতার যুগে গুপ্ত ও মৌয যুগের অবসান ঘটলে শশাঙ্ক ও পাল শাসনামলে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছিল। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মীয় গীতিকবিতা ও গান হিসেবে চর্যাপদ রচিত হয়। চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ বলা হয়ে থাকে। সেন যুগে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরো বিকশিত হয়। সেন রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন নিজেরাই বড় পন্ডিত ছিলেন। রামাই পন্ডিত, হুলায়ূধ মিশ্র, সর্বানন্দ, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ, সভাকবি জয়দেব

প্রমুখ ছিলেন এ যুগের প্রখ্যাত পন্ডিত ও গ্রন্থাকার। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এখানকার সমাজে আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের নানা ব্যবস্থা ছিল। হোলি উৎসব, নবান্ন, পৌষ পার্বনেও আনন্দ উৎসবের প্রচলন ছিল। নৃত্য, গীত, যাত্রাভিনয়, কুস্তি, শরীরচর্চা, যাদুমন্ত্র, পাশা, দাবা, নাচগান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল। গোলকধাম ও কড়ি ছিল নারীদের প্রিয় খেলা। সে যুগে বাঙালিরা বার মাসে তের পার্বণ উদ্‌যাপন করত। নাচ গানে তারা বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক-ঢোল, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত।

ধর্মীয় অবস্থা

ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের পাদপীঠ হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে ইসলাম পূর্ব যুগে বাংলায় নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সময় বাংলায় সনাতন হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং বেদান্ত ভিত্তিক সহজিয়া ধর্মেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সে যুগের অনেক ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণ অবশেষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠানাদির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাবান্ন উৎসব, চন্ডীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, শিবপূজা, দূর্গাপূজা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, হোলি, চড়কপূজা, অনার্য দেবদেবীর পূজা, ধর্মঠাকুর পূজা বিভিন্ন ও মঙ্গলানুষ্ঠান।

সারসংক্ষেপ :

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিভেদ ও গোলযোগপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও স্বাচ্ছন্দ পূর্ণ ছিল না। ভারতে এ সময় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষ সচ্ছল জীবন যাপন করত। কৃষির উন্নতি হলেও শিল্প ও বাণিজ্যের স্তিমিত অগ্রগতি হয়েছিল। ফলে তৎকালীন বাংলার সার্বিক অবস্থা মুসলিম বিজয় অভিযানের অনুকূলে ছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা এবং তিনিই ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাচীন বাংলার ছোট ছোট স্বাধীন অঞ্চল কি নামে পরিচিত ছিল?

ক) রাজ্য খ) জনপদ গ) রাষ্ট্র ঘ) সাম্রাজ্য

২. প্রাচীন বাংলার প্রধান বাহন ছিল-

ক) গরুর গাড়ি খ) ঘোড়ার গাড়ি গ) নৌকা ঘ) ভেলা

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল-

ক) পালি ভাষা থেকে খ) সৌরসেনী ভাষা থেকে গ) আরবি ভাষা থেকে ঘ) সংস্কৃত ভাষা থেকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সম্প্রতি বিশ্বের শক্তিশালী একটি দেশের প্রেসিডেন্ট একটি দেশের জনগণকে নিয়ে বর্ণবাদী বক্তব্য দিলে সে দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তেমনি বাংলার ইতিহাসে একটি রাজবংশের শাসনকালে বর্ণবাদী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণকে শোষণ করা। তবে এ সময় জনগণ বিক্ষোভ করতে সমর্থ হয়নি।

ক. পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. তখনকার হিন্দু সমাজ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সাথে আপনার পঠিত প্রাচীন বাংলার বর্ণবাদী চরিত্র সম্পর্কে লিখুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি তুলে ধরুন? ৪

পাঠ-৪.২ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়: চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলা বিজেতা বখতিয়ার খলজির জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বখতিয়ার খলজির বাংলা অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- বখতিয়ার খলজি কীভাবে মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**জায়গীর, ইকতা ও মুকতা**

ভূমিকা

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলা ছিল প্রধানত: হিন্দু-বৌদ্ধ ও কিছু সংখ্যক জৈনদের দ্বারা অধ্যুষিত জনপদ। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এয়োদশ শতাব্দির সূচনা লগ্নে (১২০৪-১২০৫ খ্রি.) এ দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে সেন শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু সমকালীন বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ভূগোলবিদদের বিবরণী, পর্যটকদের বর্ণনা, কিংবদন্তী ও লোকগাঁথা থেকে জানা যায় যে, মুসলিম অভিযানের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগযোগ ছিল। এ যোগাযোগের ভিত্তি ছিল বাণিজ্যিক ও ধর্মীয়। বণিকগণ সমুদ্র যাত্রায় জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে যাওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল হয়ে যেতেন। এতে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। মৌসুমি বায়ু প্রবাহের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য সম্পাদন করতে হত বিধায় আরব বণিকগণ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলিতে তারা বসতি গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় বাঙালিদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবে বিবাহের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে এবং বাংলায় ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী মুসলিম সমাজের ভিত রচিত হয়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির প্রাথমিক পরিচয়

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কী জাতির খলজি গোষ্ঠীভুক্ত বখতিয়ার আফগানিস্তানের গরমশীর বা আধুনিক দশতওইওমার্গওএর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। প্রথম জীবনে কর্মহীন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ভাগ্যন্বেষণে ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে গজনীতে গমন করেন। সেখানে তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাবাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অত:পর তিনি দিল্লিতে গমন করে কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনীর চাকুরি প্রার্থনা করেন। খর্বাকৃতি এবং দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বখতিয়ার খলজি দেখতে কুৎসিৎ ছিলেন বলে এখানেও তিনি ব্যর্থ হন। তিনি এরূপ ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত না হয়ে বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিনের নিকট গমন করে চাকুরির আবেদন করেন। মালিক তাঁকে অতি সামান্য বেতনে, একজন সৈনিক হিসেবে নিয়োগদান করেন। দুঃসাহসী ও উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার চাকুরি ছেড়ে বদাউন থেকে অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামুদ্দিনের অধীনে মির্জাপুরের 'ভগবত' ও 'ভিউলা' নামক দু'টি পরগণার জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি তুর্কী ও খলজি বংশজাত লোকদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলিতে অভিযান চালিয়ে ধনরত্ন সংগ্রহ করেন এবং বিহার ও বাংলা জয়ে আগ্রহী হন।

বিহার অভিযান

হুসামুদ্দিনের জায়গীরদার হিসেবে নিজের অবস্থান সুসংহত করলে চারদিকে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বখতিয়ার খলজি দিল্লির প্রশাসক কুতুবউদ্দিনের অধীনতা স্বীকার করে সর্বপ্রথম পূর্ব ভারতের বিহারে অভিযান চালিয়ে তা দখল করেন। বিহারের উদন্তপুরী বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞানচর্চা করতো, ফলে অনেকটা বিনা বাঁধায় তিনি

তা অধিকার করেন। এ সময় থেকে মুসলমানদের নিকট স্থানটি বিহার বা বিহার শরীফ নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি এ অঞ্চলের শাসনভার পেয়ে একটি বিশাল খলজি বাহিনী গঠন করেন।

নদীয়া অভিযান

বিহারকে মূল কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি পূর্ব দিকে সেনারাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলার সেনবংশীয় বয়োঃবৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। সেনদের আদি রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। নদীয়া ছিল তাদের দ্বিতীয় রাজধানী। তিনি ১২০৪ খ্রি. নদীয়া আক্রমণ করেন। নদীয়া আক্রমণের সময় বখতিয়ার বাংলার সাধারণ প্রবেশ পথ তেলিয়াগর্হির গিরিপথ দিয়ে না ঢুকে উড়িষ্যার ঝড়খন্ডের জঙ্গলের দূর্গম পথে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে মাত্র ১৭ বা ১৮ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দ্রুতগতিতে নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের হত্যা করে প্রাসাদে ঢুকে অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মূল বাহিনী এসে পড়ে। এ সময় রাজা লক্ষণ সেন মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এ আকস্মিক আক্রমণে ভীত হয়ে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই পেছনের দরজা দিয়ে নৌকা যোগে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। ফলে অনেকটা বিনা বাঁধায় নদীয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়।

লক্ষণাবতী দখল

বখতিয়ার খলজির আক্রমণে ভীত হয়ে লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গেলে বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনের রাজধানী লক্ষণাবতী দখল করেন (১২০৫খ্রি.) এবং সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি অগাধ ধনসম্পদ, অগণিত পরিচারক, পরিচারিকা ও বহুসংখ্যক হাতি হস্তগত করেন। নদীয়া অধিকারের পর তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী গৌড়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নগরটি দখল করেন। এখানে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এরপর ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন।

তিব্বত অভিযান

সাহসী বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ লক্ষ্য ছিল তিব্বত অভিযান (১২০৬খ্রি.)। সম্ভবতঃ দুঃসাহসিক নব বিজয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতেই তিনি এ অভিযান করেছিলেন। তিব্বত অভিমুখে যাত্রার পূর্বে তিনি বিজিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করেন। তিনি দশ হাজার সৈন্যসহ এ অভিযান করে ব্যর্থ হন। এতে তাঁর সেনা দলের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়। তিনি ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে শোকাহত ও হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় দেবকোটে ফিরে আসেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ভিন্ন মতে, তিনি আলী মর্দান খলজি কর্তৃক নিহত হন।

বাংলায় শাসন ব্যবস্থা চালু

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস করেন এবং এক ধরনের গোত্রীয় সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি রাজ্যকে কয়েকটি 'ইকতায়' বিভক্ত করে এর প্রতিটিতে একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইকতার শাসনকর্তাকে 'মুকতা' বলা হত। বখতিয়ার কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তাদের মধ্যে আলী মর্দান খলজি, হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি এবং মুহাম্মদ শীরান খলজি বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁর কৃতিত্ব

বাংলায় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা ছিল পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মানদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি রাজ্যময় মুসলমানদের নামাজের জন্য মসজিদ, শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা এবং ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে সুফীদের জন্য খানকা্হ প্রতিষ্ঠা করেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি যেমন ছিলেন একজন প্রতিভাবান ও দুঃসাহসিক সৈনিক তেমনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করায় এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের পথ সুগম হয়। মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের কারণেই এ দেশে ব্যাপক ধর্মান্তকরণ হয়। বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব বলা যায় যে, বঙ্গ দেশে বখতিয়ার খলজির রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল এ দেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আর্শীবাদ স্বরূপ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বিজীত অঞ্চলগুলো একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ :

উচ্চাভিলাষী ও সমর কুশলী যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় অভিযান করে ক্ষমতাসীন সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। সুশাসনের জন্য তিনি বাংলাদেশকে অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলিকে 'ইকতা' বলা হত। ইকতার শাসনকর্তাকে বলা হত মুকতা। তিনি বাংলায় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিরও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বখতিয়ারের পর বাংলায় খলজি মালিকদের শাসনের সূচনা হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
ক) বামিয়ানের খ) গরমশীরের গ) কাবুলের ঘ) কান্দাহারের

২। বাংলা জয়ের পর বখতিয়ার খলজি কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?
ক) নদীয়ায় খ) বিক্রমপুরে গ) সোনারগাঁওয়ে ঘ) গৌড়ে

৩। ইকতার প্রধান কে বলা হত-
ক) নোকতা খ) মুকতা গ) জমিদার ঘ) কৃষক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বিশ্বের সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জন্ম আফ্রিকার কেনিয়াতে। তার পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় এসেছিলেন। এই আফ্রিকান সন্তানটিই নিজ কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিসত্তা ও যোগ্যতা গুণে আমেরিকার মতো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তেমনি বাংলায় ইতিহাসেও একজন ব্যক্তি ভাগ্যান্বেষণে এদেশে এসে নিজ মেধা ও কৌশলের দ্বারা বাংলা জয় করেন ও প্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করে অমর হয়ে আছেন।

ক. মুকতা কে? ১
খ. ইকতা বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ও ইঙ্গিতকৃত শাসকদের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বাংলার শাসকের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৪.৩ বাংলায় খলজি শাসন (১২০৬-১২২৭ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলজি মালিকদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- খলজি মালিকদের শাসনের চিত্র তুলে ধরতে পারবেন ও
- খলজি মালিকদের সাথে দিল্লির সুলতানদের বহুমূখী সম্পর্কের স্বরুপ জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**বাংলার নৌবহর, নাসির আমিরুল মুমেনীন ও গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি**

[

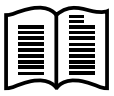

ভূমিকা

সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয় বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। কেননা এ বিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটালেও তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে তিনি এখানকার শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। ফলে ইবনে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর বাংলায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ কারণে বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু করে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বছর ছিল বাংলার ইতিহাসের গোলাযোগপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সময়। এ সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করলেও অনেকে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা সেনাশক্তি প্রেরণের অসুবিধা, সর্বোপরি শাসনকর্তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে অনেকেই দিল্লির প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করতেন। তখন দিল্লির অধীনে ছিল খলজি মালিকদের শাসন তুর্কি সুলতানদের শাসন (১২২৭-৮১ খ্রি.) এবং বলবনী শাসন (১২৮১-১৩২০ খ্রি.)।

শিরাণ খলজি

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তাঁর তিন সহযোদ্ধা মুহম্মদ শিরাণ খলজি, হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি ও আলী মর্দানের খলজির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। খলজি মালিক ও সৈন্যরা এ সময় মুহম্মদ শিরাণ খলজিকে নেতা নির্বাচিত করেন। শিরাণ খলজি মাত্র এক বছরকাল শাসকের দায়িত্ব পালন করলেও তিনি নিজ যোগ্যতাবলে আলী মর্দান খলজিকে বন্দি করাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলায় কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কিন্তু ধূর্ত আলী মর্দান খলজি কৌশলে পালিয়ে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের নিকট আশ্রয় নিলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।

হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি

শিরাণ খলজির মৃত্যুর পর হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২০৮-১২১০ খ্রি.) দিল্লির অধীনস্থ শাসক হিসেবে দেবকোটের শাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র দুই বছর পর আলী মর্দান খলজি দিল্লির সুলতানের সহায়তা নিয়ে দেবকোটে ফিরে আসলে হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি স্বেচ্ছায় শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

আলী মর্দান খলজি

হুসাম উদ্দিন স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ায় আলী মর্দান খলজি (১২১০-১২ খ্রি.) বিনা বাঁধায় শাসক নিযুক্ত হন। আলী মর্দান খলজি দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি 'আলাউদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজ্যে অরাজক অবস্থা বিরাজমান ছিল। এ অবস্থা নিরসনের জন্য অসংখ্য খলজি আমির তাঁর নির্দেশে প্রাণ হারান। দরিদ্র, দুর্বল ও শান্তি প্রিয় লোকেরা চরম

দুর্দশায় পতিত হয়। আলী মর্দান অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজ্য শাসন করায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমেই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তাঁর বিরোধী আমিরগণ আলী মর্দানের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করে হুসামউদ্দিন ইওয়াজকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি

হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি' (১২১২-২৭ খ্রি.) উপাধি গ্রহণ করে পুনরায় ১২১২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি বাংলার মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে তৎপর হন। এ ক্ষেত্রে তিনি কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিয়ে তিনি বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি বিশাল ও সুসজ্জিত নৌবহর গঠন করেন। এতে নৌ পথে আক্রমণের আশঙ্কাও কমে যায়। তাছাড়া তিন লখনৌতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বমন কোট নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। লখনৌতিতে শান্তি স্থাপন করে ইওয়ায় খলজি পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য যেমন কামরূপ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ ও ত্রিহুতে আক্রমণ চালনা করেন। ফলে এ সকল রাজ্যের রাজারা গিয়াসউদ্দিনকে উপঢৌকন ও কর প্রদানে বাধ্য হন।

দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির সংঘর্ষ

দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দিনের রাজ্য বিস্তার ও শক্তিমত্তা সুনজরে দেখেননি। এছাড়া দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় গিয়াস উদ্দিনকে দিল্লি সালতানাতের প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করে সুলতান ইলতুৎমিশ স্বয়ং তাঁকে দমনের জন্য অগ্রসর হন। ইওয়াজ খলজি স্থল পথে তাঁর সেনাদল ও নৌপথে রণতরী নিয়ে অগ্রসর হন। দিল্লি বাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষের পর তিনি একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইওয়াজ খলজি দিল্লির সুলতানকে ৮০ লক্ষ টাকা ও ৩৮টি হাতি উপহার দেন এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনে স্বীকৃত হন। ইলতুৎমিশ মালিক আলাউদ্দিন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লি ফিরে যান। এ সুযোগে ইওয়াজ খলজি আলাউদ্দিন জানীকে সরিয়ে বিহার দখল করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন। এ সময় রাজধানী লখনৌতি অনেকটা অরক্ষিত ছিল। এ সুযোগে ইলতুৎমিশের নির্দেশে পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করেন। সংবাদ পেয়ে ইওয়াজ খলজি দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দি এবং পরবর্তীতে নিহত হন। ফলে লখনৌতির রাজনৈতিক ক্ষমতা আবারও দিল্লির অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির কৃতিত্ব

গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি একজন দক্ষ ও সুশাসক ছিলেন। তাঁর সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ন্যায় বিচারচক ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। প্রজার কল্যাণে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। সামরিক মেধা, কূটনীতি ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ইওয়াজ খলজি বাংলায় প্রথম নৌবহর গঠন এবং সর্ব প্রথম রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন। মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার ন্যায় "নাসির আমিরুল মুমেনীন" বা "কাসিম আমিরুল মুমেনীন" ইত্যাদি নাম ও পদবি ব্যবহার করেন। তিনি শিল্প-সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সুফি, দরবেশ ও আলেমদের জায়গীরের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শাসনামলে অনেক পীর দরবেশ মধ্য এশিয়া থেকে বাংলায় আসেন এবং ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ নির্মাণ করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির নৌ-বহর গঠনের ফলাফল লিখুন।**

সারসংক্ষেপ :

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর বাংলায় তাঁর সহযোদ্ধা খলজি আমিরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু। খলজি আমিরদের মধ্যে মুহাম্মদ শিরাণ খলজি, হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি বা গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি, আলী-মর্দান খলজি প্রমুখ শাসকগণ বাংলা শাসন করেন। তাঁদের সাথে দিল্লির সুলতানদের সুসম্পর্ক না থাকায় খলজি মালিকগণ অধিককাল ধরে বাংলা শাসন করতে পারেননি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লখনৌতির শাসকদের মধ্যে কে প্রথম সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন?

ক) মুহাম্মদ শিরণ খলজি
খ) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি
গ) আলীমর্দান খলজি
ঘ) মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খলজি

২। কোন খলজি শাসক আব্বাসি খলিফার নাম মুদ্রায় অঙ্কন করেন ?

ক) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি
খ) মুহাম্মদ শিরণ খলজি
গ) আলীমর্দান খলজি
ঘ) মালিক সাইফউদ্দিন আইবক

৩। বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন কে?

ক) বখতিয়ার খলজি
খ) শিরাণ খলজি
গ) আলী মর্দান খলজি
ঘ) গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মাধ্যমে আরবে উমাইয়া খিলাফতের যাত্রা শুরু হয়। অতীব কূটকৌশল অবলম্বন করে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। আরব বিশ্বে তিনিই প্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। তিনি মুদ্রা জারি ও খুৎবা পাঠ করেছিলেন।

ক. বখতিয়ার খলজীর পূর্ণ নাম কী? ১
খ. প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতেন না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের উমাইয়া শাসকের সাথে বাংলার খলজি বংশের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলার শাসকের কৃতিত্ব উল্লেখ করুন। ৪

পাঠ-৪.৪ বাংলায় তুর্কি শাসন (১২২৭-১২৮১ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় তুর্কি শাসনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- তুর্কি শাসকদের সাথে দিল্লির সুলতানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবেন ও
- তুর্কি শাসনের পতনের কারণসমূহ জানতে পাবেন।

	মূখ্য শব্দ	**তুর্কি, মুঘিস উদ্দিন ও বুগরা খান**

দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের নিকট পরাজিত ও নিহত গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির মৃত্যুর পর ১২২৭ খ্রি. হতে ১২৮৭ খ্রি. পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লি সালতানাতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এ সময় দিল্লির সুলতান কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে দশ জন ছিলেন মামলুক বা দাস। তবে তারা সবাই তুর্কি ছিলেন বলে এ যুগকে তুর্কি শাসনামল বলাই যুক্তি সঙ্গত। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বিরাজমান ছিল। বাংলার মত দূরবর্তী প্রদেশের প্রতি দিল্লির সুলতানদের তৎপর হওয়ার সুযোগ ছিল না। বাংলার তুর্কি শাসকগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতেন। নিচে বাংলায় তুর্কি শাসকদের ধারাবাহিক শাসন কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১২২৭-১২২৯ খ্রি.): সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র, অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ছিলেন বাংলার প্রথম তুর্কি শাসক। তিনি গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত করে অযোধ্যার সাথে বাংলাকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি মাত্র দেড় বছর বাংলা শাসন করেন।

মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খলজি (১২২৯-১২৩০ খ্রি.): ১২৩১ খ্রি. সুলতান ইলতুৎমিশ বিহারের শাসনকর্তা মালিক আলাউদ্দিন জানীকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খলজি উপাধি ধারণ করেন। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস বাংলা শাসন করেন।

মালিক সাইফুদ্দিন আইবক (১২৩২-১২৩৫ খ্রি.): ইলতুৎমিশ আলাউদ্দিন জানীকে অপসারণ করে বিহারের শাসনকর্তা মালিক সাইফুদ্দিন আইবককে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন একজন তুর্কি ক্রীতদাস। তিন বছর কৃতিত্বের সাথে তিনি বাংলা শাসন করেন।

আওর খান আইবক (১২৩৫-১২৩৬ খ্রি.): সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যু হলে দিল্লিতে গোলযোগ দেখা দেয়। এ সুযোগে আওর খান আইবক লখনৌতির ক্ষমতা দখল করে নেন। তবে অল্পকাল পরেই বিহারের শাসনকর্তা তুঘরিল তুঘান খানের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে।

তুঘরিল তুঘান খান (১২৩৬-১২৪৫ খ্রি.): আওর খানকে পরাজিত করে তুঘরিল তুঘান খান ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ৯ বছর বাংলা শাসন করেন।

মালিক কমরউদ্দিন তমর খান (১২৪৫-১২৪৭ খ্রি.): তুঘরিলের মৃত্যুর পর মালিক কমরউদ্দিন তমর খান বাংলার শাসনভার লাভ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর লখনৌতি শাসন করেন।

জালাল উদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭-১২৫১ খ্রি): তমর খানের পর জালাল উদ্দিন মাসুদ বাংলা শাসন করেন। তিনি লখনৌতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি ১২৫৫ খ্রি.''মুঘিস উদ্দিন'' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৫৭ খ্রি. তিনি কামরূপ আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হন।

সুলতান মুঘিসউদ্দিন উযবক (১২৫১-১২৫৭): জালালুদ্দিনের মাসুদ জানির পর অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন উযবক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় ছয় বছর বাংলা শাসন করেন।

মালিক ইযউদ্দিন বলবন-ইউযবকী (১২৫৭-১২৫৯): সুলতান মুঘিসউদ্দিনের নিহত হওয়ার পর মাসুদ জানির জামাতা মালিক ইযউদ্দিন ইউযবক লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন এবং দু'বছর প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন।

তাজউদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-১২৬৫ খ্রি.): তিনি খাওয়ারিযমের জনৈক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি বাহুবলে লখনৌতির সুলতান নিযুক্ত হন।

মুহাম্মদ তাতার খান (১২৬৫-১২৬৮ খ্রি.): আরসালান খানের পর তাতার খান বাংলার শাসনকর্তা হন। তিনি দিল্লির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও কয়েক বছরের মধ্যে দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

শেরখান (১২৬৮-১২৭২ খ্রি.): তাতার খানের পর শেরখান লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় চার বছর বাংলা শাসন করেন।

আমিন খান (১২৭২ খ্রি.): শেরখানের পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন কর্তৃক অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তুঘরিল খান কর্তৃক পরাজিত হন।

সুলতান মুঘিসউদ্দিন তুঘরিল খান (১২৬৮-১২৮১ খ্রি.): বাংলার তুর্কি শাসকদের মধ্যে তুঘরিল খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পূর্ব বাংলায় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। তুঘরিল খান 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ সংবাদে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অত্যন্ত বিচলিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে বলবন প্রেরিত পর পর দুটি অভিযান-ই ব্যর্থ হয়। অবশেষে বলবন ক্ষুদ্ধ হয়ে নিজেই কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সাথে নিয়ে বাংলায় তুঘরিলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই শাস্তিমূলক অভিযানে ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে তুঘরিল সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। সপরিবারে তুঘরিলকে হত্যা ও লখনৌতিকে ধ্বংস করে স্বীয়পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বলবন দীর্ঘ তিন বছর পর দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বুগরা খান তাঁর শাসিত বাংলা প্রদেশকে দিল্লি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার স্বাধীন দেশে পরিণত করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলার তুর্কি শাসকদের একটি তালিকা তৈরি করুন।**

সারসংক্ষেপ :

বাংলায় তুর্কি যুগে প্রায় পনের জন শাসক ছিলেন। এ সময় দিল্লিতে গোলযোগ ও কোন্দোল থাকায় তুর্কি শাসকগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় বলবনী শাসনের সূচনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তুঘরিল তুঘান খান বাংলা শাসন করেন?
ক) সাত বছর খ) আট বছর গ) নয় বছর ঘ) দশ বছর

২। বুগরা খান দিল্লির কোন সুলতানের পুত্র ছিলেন ?
ক) সুলতান ইলতুৎমিশ খ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন
গ) সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ঘ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক

৩। বাংলায় মোট কতজন তুর্কি শাসক ছিলেন ?
ক) ১৪ জন খ) ১৫ জন চ) ১৬ জন গ) ১৭ জন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাংলার শাসকগণ সবসময় স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করতে পছন্দ করতেন। তাই অনেক শাসকই বারবার বিদ্রোহী হয়েছেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তেমনই বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ইলিয়াস শাহ। তিনি সমগ্র বাংলা একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলে। তিনি দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

ক. কতজন তুর্কি প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন? ১
খ. বাংলায় তুর্কি শাসকদের সম্পর্কে লিখুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে বাংলার কোন তুর্কি শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের রাজবংশের মতো বাংলায় তুর্কি শাসকদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান' –বক্তব্যটি মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৪.৫ বাংলায় বলবনী শাসন (১২৮১-১৩২০ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় বলবনী শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বুগরা খান ও পুত্র কায়কোবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ও
- বলবনী শাসন সমাপ্তির ইতিহাস জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**বুগরা খান, আমির খসরু, পাণ্ডুয়া ও বাহরাম শাহ**

ভূমিকা

বাংলায় তুর্কি শাসকগণ দিল্লির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করায় দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার শাসক মুঘিস উদ্দিন তুঘরিল-এর বিরুদ্ধে নিজপুত্র বুগরা খানকে প্রেরণ করেন। বুগরা খান তুঘরিলকে দমন করে নিজে এখানে অবস্থান করতে শুরু করলে বাংলায় সরাসরি বলবনী শাসনের সূত্রপাত ঘটে। নিচে বাংলায় বলবনী শাসকদের ধারাবাহিক শাসন কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

বুগরা খান (১২৮৭-১২৯০ খ্রি.)

দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুঘিস উদ্দিন তুঘরিলকে হত্যা করলে বাংলায় স্বাধীন তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। তিনি বাংলাকে দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করে পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ খান বা বুগরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লিতে ফিরে যান। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পুত্র বুগরা খান দিল্লির অধীনে শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বুগরা খান বাংলাকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেন।

বুগরা-কায়কোবাদ দ্বন্দ্ব

বুগরা খান ''সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ'' উপাধি ধারণ করে ১২৮৭ খ্রি. থেকে ১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন। পিতা বলবনের অনুরোধ সত্ত্বেও দিল্লির শাসনভার গ্রহণ না করায় বলবন বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লির শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তরুণ সুলতান আরাম আয়াসে দিনাতিপাত করতে থাকেন। এ সুযোগে মন্ত্রী নিজামউদ্দিন রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠে ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বুগরা খান দূর থেকে পুত্রকে পত্র লিখেও সৎপথে আনতে ব্যর্থ হন। বিরক্ত হয়ে তিনি একটি বাহিনী নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সংবাদে কায়কোবাদ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে সরযু নদীর উভয় তীরে দু, পক্ষের শিবির স্থাপিত হয়। কিন্তু পুত্র কাযকোবাদ স্বপ্রণোদিত হয়ে পিতা বুগরা খানের নিকট সমঝোতার প্রস্তাব দিলে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। পিতা-পুত্রের এ মিলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'ভারতের তোতা পাখি' খ্যাত কবি আমির খসরু 'কিরান-উস-সাদাইন' নামক কালজয়ী কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। বুগরা খান পুত্রকে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত অনেক উপদেশ দিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে দিল্লির সুলতান বাংলার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। বুগরা খান তাঁর রাজ্যকে বিহার, সাতগাঁও, বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) এবং দেবকোট (উত্তরবঙ্গ)-এ চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি বেশিদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেননি। পুত্র কায়কোবাদ নিহত হলে তিনি স্বেচ্ছায় পুত্র কাইকাউসের উপর রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন।

সুলতান রুকন উদ্দিন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ খ্রি.)

বুগরা খান স্বেচ্ছায় পুত্র কায়কাউস এর হাতে বাংলা ও বিহারের শাসনক্ষমতা অর্পণ করলে কায়কাউস ১২৯১ খ্রি. সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় দশ বছর কৃতিত্বের সাথে রাজত্ব করেন। দিল্লিতে তুর্কি-মামলুকদের পতন ঘটিয়ে খলজিগণ ক্ষমতা দখল করলে বহু তুর্কি বাংলায় চলে আসেন। দিল্লির খলজি সুলতানদের আমলে বাংলা আক্রান্ত না হওয়ায় বাংলার সুলতান কায়কাউস নির্বিঘ্নে শক্তি বিস্তার ও শাসন সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় বহু মুসলিম সুফি, আলেম, ফকির দরবেশ বাংলায় এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টা করেন। এ সকল আলেম ও সুফিদের মধ্যে

কাজী রুকনউদ্দিন সমরকন্দী, শেখ জালাল উদ্দিন তাবরেজী ও মাওলানা শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সুলতানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাংলায় বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ ও খানকাহ নির্মিত হয়। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে পীর-দরবেশদের খানকায় গমনের ফলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে।

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রি.)

রুকনউদ্দিন কায়কাউসের পর সুলতান হন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি একুশ বছর বাংলা শাসন করেন। মেধা ও যোগ্যতাবলে প্রথমে তিনি বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। একজন বিজেতা হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোনারগাঁও ও সাতগাঁও ছাড়াও ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল তাঁর সময়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। তাঁর সময় সুফি-দরবেশগণ বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত ছিলেন। ফিরোজ শাহ একজন শক্তিশালী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তিনি লখনৌতি হতে পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পাণ্ডুয়ার নাম দেন ফিরোজাবাদ। ফিরোজ শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ বার বছর পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের উপর তার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। বাংলা মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণে তাঁর অপরিসীম অবদান ছিল।

শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের পুত্রদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব

সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র যথা: শিহাবউদ্দিন বুগরা শাহ, নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম শাহ ও গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধে। তেজস্বী ও উচ্চাকাঙ্খী বাহাদুর শাহ লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করলে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই নাসির উদ্দিন ইব্রাহিম দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে একটি সৈন্য দল প্রেরণ করেন। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হলে পূর্ববঙ্গে তাতার খানকে এবং পশ্চিম বঙ্গে নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম শাহকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর পরাজিত গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক বন্দি করে দিল্লি নিয়ে যান। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের মৃত্যুরপর মুহাম্মদ বিন তুগলক দিল্লির সুলতান হয়ে প্রায় তের বছর বাংলার উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। তিনি এ সময় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বাংলায় চলে আসেন। মুহাম্মদ বিন তুগলক সোনারগাঁও এর শাসনভার যৌথভাবে তাঁকে এবং তাতার খানকে দেন। এদিকে তাতার খান 'বাহরাম শাহ' উপাধি নিয়ে সোনারগাঁওয়ে মুহাম্মদ বিন তুগলকের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বিদ্রোহী হয়ে নিজ নামে মুদ্রা জারি করেন। এতে বাহরাম শাহ তাঁর বিরুদ্ধে ১৩৩০ খ্রি. অভিযান পরিচালনা করেন। সংঘর্ষে বাহাদুর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে বাংলায় বলবনী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন সুলাতানি শাসনের সূত্রপাত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**গিয়াসউদ্দিন বলবন ও পুত্র বুগরা খানের মধ্যকার সম্পর্কে বিষয়ে একটি চার্ট তৈরি করুন।**

সারসংক্ষেপ :

বুগরা খান ছিলেন বাংলায় বলবনী বংশের প্রথম শাসক। কাইকাউস ও শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন এ বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক। শামসুদ্দিন ফিরোজের মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ দেখা দেয়। এ সুযোগে দিল্লির তুগলক শাসকগণ বাংলার শাসকদের ভাগ্যবিধাতা বনে যান। বাহরাম শাহ কর্তৃক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর সংঘর্ষে নিহত হলে বাংলায় বলবনী বংশের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় বলবনী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

ক) কাইকাউস খ) বুগরা খান গ) শাসমউদ্দিন ফিরোজ শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর

২। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ রাজধানী লখনৌতি থেকে স্থানান্তর করেন?
ক) সাতগাঁও-এ খ) সোনারগাঁও-এ গ) পাণ্ডুয়ায় ঘ) ফিরোজাবাদে

৩। 'বাহরাম শাহ' উপাধি ধারণ করেন?
ক) কাইকাউস খ) গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর গ) তাতার খান ঘ) নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম

৪। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল-
ক) বলবন-কায়কাউসের মধ্যে খ) বুগরা খান-কায়কোবাদের মধ্যে
গ) ফিরোজ শাহ-বুগরা খানের মধ্যে ঘ) বুগরা খান-কায়কাউসের মধ্যে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ভারতবর্ষের মুঘলদের একজন পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট শাহজাহানের জীবিত অবস্থায়ই তার চার পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এ দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেব বিশেষ নেতৃত্বগুণ ও কৌশলী বুদ্ধিমত্তার কারণে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ কৃতিত্বের সাথে শাসন করেছিলেন।

ক. বাংলার শাসক বুগরা খানের উপাধি কী? ১
খ. বুগরা খান কেমন শাসক ছিলেন উল্লেখ করুন। ২
গ. উদ্দীপকের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সাথে বাংলার কোন বলবনী শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ বলবনী শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১. ক ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ